Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 96 - 103
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

স্মৃতিপটে ‘স্মৃতিকণা’ : পাঠকের দৃষ্টিতে কবি পঙ্কজিনী বসু

অয়ন্তিকা সরকার
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটী
Email ID : ayantikaasru@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Female poet, Bengali poetry, Seventeen, Female Education, Independent voice, Self-enquiry, Broader meaning of life, Self-awareness, Eternal melody.

Abstract
The number of women poets in 19th century Bengali literature is not scarce. Their poetry added a distinct voice to the literary repertoire of that age. Since ‘Charyapada’, a series of talented women poets have adorned the bower of Bengali literature with their emotion, feelings, intellect, and style. Although the term ‘poet’ denotes a complete intellectual faculty that is gender neutral and holistic, some women poets of 19th century Bengali literature deserve special mention for certain reasons. Not because their poems are formally feministic as per strict academic parameters, but for the spontaneous expression of feminine experience in their works. Their voice as mother, wife, daughter, beloved or as a female friend or sister are recorded in their verses. Poet Pankajini Basu belongs to the undivided Bengal. Her brief tryst with poetry lasted only for four years until death muted her at the tender age of seventeen. Her vision as a teenage poet and specially her use of poetry as a vehicle for experimenting with her own adolescent psyche make her works curious documents of contemporary feminine experience. Her keen sound mind and inquisitive soul reflects brightly its promise and talent. Her collected poems were published as Smritikana. In that profound text, the readers find eternal melodies of wonder that captivate them.

Discussion

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে মহিলা কবিদের উপস্থিতি এমন কিছু অভূতপূর্ব ঘটনা নয়। সেরকমই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মহিলা কবিদের উপস্থিতি অত্যন্ত স্বাভাবিক, স্বাভাবিক তাঁদের জাজ্জ্বল্যমান প্রতিভার বিচ্ছুরণ, যার আলোয় আলোকিত বাঙালী সমাজ ও সাহিত্য। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য এমন অগণিত মহিলা কবিদের লেখনীর স্বাতন্ত্র্যে সমৃদ্ধ। সকলেই যে সমান পরিচিতি বা পাঠকমহলে সমান সমাদর পেয়েছেন, এমনটা নয় কিন্তু তাঁদের কবিতায় ধ্বনিত হয় এক চিরন্তনী সুর।

উনিশ শতক এমন এক সন্ধিক্ষণ যে সময় বাংলা ও বাঙালী জাতি নবজাগরণের সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রস্তুত করছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী নতুন করে যেন মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাত ধরে বাঙালী সমাজ যাত্রা শুরু করেছিল এক অনন্য নবজাগরণের অভিমুখে কিন্তু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমাজের সর্বস্তরে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বাঙালীর অন্দরমহলে সাদরে গ্রহণযোগ্য না হলেও নারীশিক্ষার প্রচার ও প্রসার ক্রমশ অঙ্কুরিত হচ্ছিল। আরও স্পষ্ট করে বললে সমাজের উচ্চবিত্ত পরিবারগুলি এবং ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী পরিবারগুলিতে নারী শিক্ষার ধারা সহজেই প্রবেশ করতে পেরেছিল। বৈদিকযুগ থেকে অপালা, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষী নারীদের নামোল্লেখ পাওয়া যায় অর্থাৎ নারীশিক্ষা ভারতবর্ষে নতুন তো নয়ই বরং সুপ্রাচীনকাল থেকে এই রীতি বিদ্যমান ছিল। মধ্যযুগের সময়কাল পেরিয়ে আবার শিক্ষার অমলিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল জনমানসে। মায়ের শিক্ষা ব্যতীত সন্তানের শিক্ষা সম্পন্ন হয়না, এই বোধ জাগিয়ে তোলার জন্যই উনিশ শতকীয় বাংলা নজাগরণের পুরোধা পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্গদেশে নারীশিক্ষার অন্যতম কাণ্ডারী হয়ে উঠেছিলেন। ফলস্বরূপ বাংলায় এল নারীশিক্ষা সম্পর্কিত নানা আন্দোলন। অন্যদিকে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত রমণীকুল শুরু করলেন কাব্যচর্চা। প্রথমদিকে হয়তো একান্ত নিজস্ব, গোপন কোনো অনুভূতি, ভালোবাসা, ব্যথা বা বিরহব্যাকুলতা প্রকাশের জন্য কবিতাকে মাধ্যম করেছিলেন তাঁরা। সেগুলি ছিল একান্ত ব্যক্তিগত আবেগের দলিল। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে সেইসব মহিলারা অন্তঃপুরের চৌকাঠ পেরিয়ে দেশ ও দশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত হয়েছেন, সচেতন হয়েছেন তখনই তাঁরা কলম ধরেছেন পারিপার্শ্বিকের জন্য। আমিত্বের বন্ধন কাটিয়ে নিজের সৃষ্টিকে সকলের জন্য নির্মাণ করেছেন। উনিশ শতকে লিখিত *চিত্তবিলাসিনী* নামের যে কাব্যগ্রন্থটি পাওয়া যায় তার লেখিকা একজন বাঙালী গৃহবধূ, নাম কৃষ্ণকামিনী দাসী। এটি ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বলা যেতে পারে এটি ঐ সময়কালে লিখিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ, যার রচয়িতা একজন মহিলা। এছাড়াও সমসাময়িক বিশিষ্ট মহিলা কবিদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, মানকুমারী বসু, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, বিরাজমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, সরলা দেবী চৌধুরানী প্রমুখেরা উল্লেখযোগ্য।

পঙ্কজিনী বসু উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের কবিদের মধ্যে বিশেষতঃ মহিলা কবিদের তালিকায় তুলনায় স্বল্প আলোচিত একটি নাম। অবশ্য তাঁর সীমিত আয়ুষ্কালই এর কারণ। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের শ্রীনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রী নিবারণ চন্দ্র মুস্তাফীর কন্যা পঙ্কজিনীর বিবাহ হয়েছিল বিক্রমপুরেরই বজ্রযোগিনী গ্রামনিবাসী কুমুদবন্ধু বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র আশুবোধ বসুর সাথে। প্রথাগত বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষালাভের সুযোগ পঙ্কজিনীর হয়নি। কবি পঙ্কজিনী বসুর দৌহিত্র দেবব্রত গুহ *স্মৃতিকণা* গ্রন্থের 'পূর্বলেখ' অংশে বলেছেন,

> "বালিকা বধু হয়ে শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ। শ্বশুর মহাশয় কুমুদবন্ধু বসু। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুবোধ বসুর সহিত বিবাহ হয়। ইংরেজী-ভাবাপন্ন পরিবার। শ্বশুর শিক্ষাবিভাগের সাথে জড়িত স্কুল পরিদর্শক ছিলেন। কিন্তু বালিকা বধু পুঁথিগত বিদ্যালাভ করেনি। সুযোগ দেওয়া হয়নি। বাংলা, কিছু ইংরেজী শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায়।"[১]

আবার এই গ্রন্থেরই বিজ্ঞাপন অংশে বলা হয়েছে,

> "পঙ্কজিনীর বিদ্যালয়ের শিক্ষা অতি সামান্য ছিল। পিতৃগৃহে অবস্থানকালে নিজের চেষ্টায় অভিধানের সহায়তা লইয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত ও টডের রাজস্থানের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন, ইহার অধিক আর কিছু শিক্ষা তখন হয় নাই। কিন্তু তাঁহার স্মরণশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, যাহা একবার পাঠ করিতেন তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না এবং তাহার অধিকাংশ স্থলই আবৃত্তি করিতে পারিতেন।"[২]

এই দুটি বক্তব্যের মধ্যে কিছু পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে সত্যি আর তার কারণ হল পঙ্কজিনী বসুর কোনো প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থের সন্ধান না পাওয়া। উপরের বক্তব্যদুটি থেকে যেটুকু সাধারণ তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে বালিকা পঙ্কজিনীর বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিশক্তি ও অধ্যবসায়ের কথা অনুধাবন করা যায়। শুধু তাইই নয়; তাঁর কবিত্বপ্রতিভা ছিল সহজাত।

কবি পঙ্কজিনী বসু তেরো বছর বয়স থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন, সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কবিতা লিখেছিলেন। *স্মৃতিকণা* বইটির প্রকাশের প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবেই কিছু কথা আসে। প্রথম ১৯১৬ সালে এই বইটি মোট আটান্নটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার মিন্টো প্রেস থেকে। যদিও সেই মুদ্রিত বইটি বর্তমানে পাওয়া যায়না।

কবির দৌহিত্র শ্রী দেবব্রত গুহ বইটি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। এই বইটি 'নতুন সংস্করণ' নামে কলকাতার পদ্মা-গঙ্গা পাবলিকেশন থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্তমানে প্রাপ্ত পঙ্কজিনী বসুর *স্মৃতিকণা* গ্রন্থে মোট ছাপান্নটি কবিতা রয়েছে। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু বিবিধ এবং সেই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' এর একটি অংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন-

> "কবিতাগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া নিম্নলিখিত ক্রমে সন্নিবেশিত হইল- ১. আধ্যাত্মিক ও ধর্ম-বিষয়ক, ২. প্রেম-বিষয়ক, ৩. সামাজিক এবং ৪. প্রকৃত ঘটনা ও আত্ম-বিষয়ক।"[৩]

আরো বলা হয়েছে-

> "যে কবিতা যে যে ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে তাহা যতদুর জানিতে পারা গিয়াছে উহার শিরোভাগে বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে।"[৪]

অবশ্য গ্রন্থের সূচিপত্রে এরকম কোনো বিষয় অনুসারী বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে কয়েকটি কবিতার শিরোনামের নিচে এরকম লেখা দেখা যায় কিন্তু লেখাগুলি থেকে একথা স্পষ্ট যে সেগুলি স্বয়ং কবির লেখা নয়। যেমন-'নামের কি গুণ!' কবিতার নিচে লেখা রয়েছে- 'রচয়িত্রীর শ্বশ্রুমাতার দীক্ষার গ্রহণ উপলক্ষ্যে লিখিত'[৫] আবার 'কোথায় মরণ?' কবিতাটির নিচে রয়েছে- 'রোগশয্যায় রচয়িত্রীর মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে লিখিত'[৬] ইত্যাদি। এছাড়াও 'আত্মঘাতিনী' কবিতাটি 'কোন দুশ্চরিত্র ব্যক্তির স্ত্রী আত্মহত্যা করিলে তদবলম্বনে লিখিত' (পৃ. ৭০), 'শুভদিন' শীর্ষক কবিতার বিষয়বস্তু বিষয়ে বলা হয়েছে 'ঢাকা নগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে' (পৃ. ৭৯)। তবে এ রকম কবিতার সংখ্যা খুবই কম। বিজ্ঞাপনের উদ্ধৃত মন্তব্যটি পাঠককে প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে হলেও কবিতাগুলির অনুপুঙ্খ পাঠ সচেতনপাঠকের মনে সেগুলির বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্য তুলে ধরে।

কবি পঙ্কজিনী বসুর আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রতিবিম্ব তাঁর ঐ বিষয়ক কবিতাগুলি। এই সংকলনের প্রথম কবিতা 'প্রার্থনা'। *বঙ্গের মহিলা কবি* গ্রন্থে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই কবিতাটিকে কবির লেখা প্রথম কবিতা বলে মনে করেছেন আবার তিনি একথাও বলেছেন,

> "তিনি কবিতা লিখিয়া প্রায়শঃই লুকাইয়া রাখিতেন, কাহাকেও দেখাইতেন না।"[৭]

মহাকবি কালিদাস *রঘুবংশম্* মহাকাব্যের প্রারম্ভিক পর্যায়ে নিজেকে 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' বলেছিলেন।[৮] পঙ্কজিনী মনের স্বাভাবিক আবেগ স্ফুরণের জন্য কবিতাকে নিজের মাধ্যম করে নিয়েছিলেন। কবিতার ভাষাতেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন তিনি। তাঁর লেখা কয়েকটি কবিতা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে-

> "দয়াময়, চাহ যদি করুণা-নয়নে,
> কর যদি কৃপাদৃষ্টি এ দাসীর পানে,
> তবে এ জগতে আর
> কি ভয় আছে আমার?
> আমি অতি ক্ষুদ্র, দেব, তবুও আমায়
> করুণা করিয়া, নাথ, রাখ যদি পায়।"[৯] (প্রার্থনা/স্মৃতিকণা)

এই কবিতারই পরবর্তী কয়েকটি পংক্তিতে কবি বলছেন-

> "সমর্পিয়া তব পদে ধন, মান, কায়া
> থাকিব সংসার-বনে
> নিশ্চিন্ত নির্ভয় মনে।"[১০] (প্রার্থনা/স্মৃতিকণা)

একজন সদ্য বিবাহিতা কিশোরীর কলমে এ হেন ঈশ্বরচিন্তা বিস্ময়োদ্রেককারী। কতো অল্পবয়সেই সংসারের মায়ামোহ, অসারতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন পঙ্কজিনী। তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তার অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি কবিতায়। যেমন 'আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায়' কবিতায় তিনি অনায়াস, অকুণ্ঠ ভঙ্গিতে মৃত্যুকে অনন্ত সত্যরূপে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বীকার করেছেন, মৃত্যুর অমোঘত্ব মেনে নিয়েছেন। নিজের গভীরে উপলব্ধি করেছেন যে, মৃত্যুই একমাত্র সত্য নয়। বিশ্বচরাচর, জীবন-মৃত্যু আদতে মহাকালের অংশমাত্র আর মানবজীবন তার আরও ক্ষুদ্র এক কণা। এই কবিতাটির ছত্রে ছত্রে কবির আত্মোপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে। উপনিষদের অন্যতম মহাবাক্য 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' ফুটে উঠেছে পঙ্কজিনীর লেখায়; যেখানে তিনি বলছেন-

"কভু নাহি হ্রাস ক্ষয়
আমি অচ্যুত অব্যয়,
ক্ষয় যদি হই, তবে বর্ত্তে দেবতায়।
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায়!"[১১]

নিজেকে 'ঈশ্বরের প্রতিরূপ' বলে মনে করেছেন তিনি। ব্রহ্মকে নিজের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। আবার 'জীবন রহস্য' কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে নশ্বর জীবনের বাস্তবতা-

"জনম-অজ্ঞানে ঢাকা, মরণ আঁধারে রয়;
মাঝে দুটি দিন তবে ধরা-সাথে পরিচয়।"[১২]

এছাড়াও 'সকলি মঙ্গল', 'একি কারাগার' ইত্যাদি কবিতাগুলিও কবির আধ্যাত্মিক চেতনার উজ্জ্বল উদাহরণস্বরূপ। রোগশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর সামান্য কয়েকদিন আগে তিনি তাঁর ঈশ্বরকে স্মরণ করেছেন, যাবতীয় ঐহিক দুঃখ, শারীরিক বেদনার উপশমকর্তা 'উদারচেতা' ঈশ্বরকে আহ্বান করেছেন।

পরবর্তী পর্যায়ের কবিতাগুলিতে প্রেম ও সৌন্দর্যের পূজারিণী পঙ্কজিনীর পরিচয় পান পাঠক। যিনি আকণ্ঠপিপাসায় সৌন্দর্যসুধা পানের তীব্র আকাঙ্খা জানিয়েছেন-

"সৌন্দর্যের উপাসক, সৌন্দর্যের চিরদাস,
সৌন্দর্য হৃদয়ে রাখি, পূজি বারমাস।"[১৩]

উনিশ শতকীয় কবিতারচনার প্রচলিতধারা অনুযায়ী, আধ্যাত্মিক কবিতা ও প্রেমের কবিতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না, এ যেন সেই- "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

প্রেমের যে চিরন্তন সংজ্ঞা নারীমনে আঁকা থাকে তাতে ঈশ্বরচিন্তা কিংবা প্রিয়ের প্রতি প্রেম কোথাও যেন একাকার হয়ে যায়। পঙ্কজিনী বসুর কবিতাতেও এই বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার কবিতা ও প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলি যেন একে অন্যের প্রতিবিম্ব। প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলিতেও পাঠক এক অনন্ত জিজ্ঞাসা অনুরণিত হতে দেখেন। 'কোথা সুখ' কবিতায় যে প্রশ্ন ঘুরে ফিরে এসেছে, সুখের উৎসমুখ অনুসন্ধানের যে প্রবল আকুতি মনুষ্যচরিত্রে কবি দেখেছেন, তার উত্তর তিনি স্বয়ং দিয়েছেন-

"সুখ নাহি কভু থাকে বাহিরেতে
সুখ নর-হৃদয়ালয়ে
বসিয়া করিছে হাস্য- কৌতুকেতে
নিজ আদর হেরিয়ে।
নীরবে গোপনে সবার হৃদিতে
সুখের নির্ঝর লাগিছে বহিতে,
ফল্গুসম অন্তঃসলিলা হইয়ে
আছে সুখ এ জগতে।"[১৪]

পঙ্কজিনীর এই পর্বের কবিতাগুলির এক অদ্ভুত বেদনাঘন আবেদন রয়েছে। তীব্র বিষাদ, মৃত্যুচেতনা, জীবনের অনিত্যতা সমস্তকিছু মিলে মিশে যেন 'কি চাহিব?', 'হাসিতেই হবে?' বা 'তাই থাকি দূরে'-র মতো কবিতাগুলি পাঠকের মনে জাগতিক অসারতার বোধ জাগিয়ে তোলে, পাঠক আত্মানুসন্ধানে রত হয়। নিজস্ব অতৃপ্তি, সংসারের কঠোর নিয়মের বেড়াজালে আবর্তিত হতে হতে কবিতাই যেন কবির একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। যেহেতু পঙ্কজিনীর কোনো প্রামাণ্য জীবনী পাওয়া

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যায়না তাই এই বিষাদ কেবলমাত্র আবেগপ্রবণ কবিমনের প্রকাশ নাকি ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখমথিত উপাখ্যানের কাব্যরূপ – পাঠকের সেই প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে যায়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, একজন সতেরো বছরের কিশোরীর চিন্তন, তাঁর মনন কতোখানি পরিণত হলে তবে ঐ স্বল্পবয়সে তাঁর পক্ষে এধরণের চিন্তা করা সম্ভব এবং আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হল তিনি সেই অর্থে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। এত স্বল্পজীবনীকালে এত মহৎ চিন্তা ব্যতিক্রমী অবশ্যই। শুধু যে আধ্যাত্মচিন্তা বা প্রেমের স্বরূপ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি ব্যতিক্রমী ছিলেন তা নয়; এই প্রসঙ্গে তাঁর সমাজসচেতনতার কথাও আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে। *স্মৃতিকণা* গ্রন্থটিতে এমন অনেকগুলি কবিতা রয়েছে যেগুলির মূলবিষয় সমাজসচেতনতা। একজন প্রকৃত সাহিত্যিকের মতো তিনি সমকালীন সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং সেই বিষয়গুলি অবলম্বন করে কবিতা লিখেছিলেন। বিধবাদের দুর্দশা, তাঁদের করুণ অবস্থা, বধূ নির্যাতন ইত্যাদির মতো সেযুগের বহুলচর্চিত, বহুলআলোচিত বিষয় অবলম্বন করে তিনি কবিতা রচনা করেছিলেন।

তেমনি বঙ্গদেশের তথাকথিত ‘আধুনিক’ ‘শিক্ষিত’ বঙ্গসন্তানদের জীবনযাত্রা দেখে ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাত করতেও পিছুপা হননি। ‘বাঙ্গালীর ছেলে’ কবিতাটি যেন সেই সময়ের যুবসমাজের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরে পাঠকের সামনে-

“বাঙ্গালীর ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়,
নিস্তেজ দুর্বল হিয়া,
প্রলোভনে পদ দিয়া,
শেষে অনুপায় দেখি, করে “হায় হায়!
বাঙ্গালীর ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়,”[১৫]

আবার-

“ফিরায়ে চিকণ কেশ,
চুরুট ফুকায় বেশ,
ঘড়ি, ছড়ি, চশমাতে কিবা শোভা পায়!
বাঙ্গালীর ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়,”[১৬]

শুধু বাইরের জগতেই নয়; অন্তঃপুরের চারদেওয়ালের মধ্যে নিত্যকার অশান্তি যে কোনো পরিবারের ভিত দুর্বল করে তোলে আর তাতে যে আসলে বৃহত্তর সংসারের ক্ষতি হয়, সেকথাও তিনি বলেছেন এই কবিতায়-

“কদাচারে কাঁদে জায়া
বাপমায়ে নাহি মায়া,
ভাই বোনে নাহি পালে স্নেহ-মমতায়;
বাঙ্গালীর ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়,”[১৭]

কিন্তু শুধু হতাশা নয়, ‘ঘুমায়ো না আর’ কবিতায় কবি আশায় বুক বেঁধে নতুন কর্মযজ্ঞে এগিয়ে যেতে আহবান করেছেন-

“সাহসে বাঁধিয়া বুক,
তেয়াগিয়া স্বার্থ সুখ,
পর-উপকারে হৃদি ঢাল একবার।
ঘুমায়ো না আর।”[১৮]

কবি পঙ্কজিনীর কাব্যগ্রন্থ *স্মৃতিকণা* যেন কতকটা তাঁর আত্মজীবনী। ‘লজ্জাশীলা’ কবিতাটিতে তিনি প্রেয়সীরূপা, ব্রীড়াবনতা বধূর মতো কাঙ্ক্ষিত পুরুষটির প্রতি নিজের প্রেমের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু নিজমুখে ভালবাসার কথা উচ্চারণ করতে পারেন নি তিনি তাই কবিতাই হয়ে উঠেছে তাঁর ভাব প্রকাশের ভাষা। ‘জীবন্ত পুতুল’, ‘প্রাণপ্রতিমা’, ‘ঘুম-পাড়ানী’ কবিতাগুলি পঙ্কজিনীর মাতৃসত্ত্বার পরিচায়ক। একমাত্র কন্যাসন্তান ঊষা। মাত্র দেড় বছর নিজের আত্মজাকে কাছে পেয়েছিলেন তিনি। তার জন্ম, কথা বলা এমনকি প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস যেন তাঁর নিজের সত্ত্বার সাথে জড়িয়ে। তাই পঙ্কজিনীর মাতৃসত্ত্বা যেন

তাঁর কবিসত্ত্বার সাহায্যে নিজের বাৎসল্যের স্রোতধারার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন শব্দ আর ছন্দের কাঠামোয়। উভয়সত্ত্বার অনবদ্য মেলবন্ধন ধরা পড়ে পাঠকের চোখে। 'জীবন্ত পুতুল' কবিতাটি যেন অপার মাতৃস্নেহের আধার-

"সে যে এক জীবন্ত পুতুল,
শত জন্ম পুণ্যফলে
শত তপস্যার বলে
এসেছে প্রভাতকালে হয়ে অনুকূল।"[১৯]

এই মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর সমস্ত কাজ ভুল হয়ে যায়, ভুল হয়ে যায় জাগতিক সমস্ত দৈনন্দিনতা-

"সে যে এক জীবন্ত পুতুল;
সারা দিন চেয়ে থাকি,
মুগ্ধ অনিমেষ আঁখি,
তবুও অন্তরে থাকে অতৃপ্তির হুল।
নিয়ে গেছে স্নেহ, প্রীতি,
নিয়েছে কবিতা, স্মৃতি,
কাড়িয়া নিয়াছে মোর হৃদয়ের মূল।"[২০]

সন্তানের মঙ্গলকামনায় মায়ের আশীর্বাদের কথা রয়েছে 'প্রাণপ্রতিমা' কবিতাটিতে। আবার সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে 'ঘুম-পাড়ানী' কবিতাটিতে যেভাবে তিনি শিশুকন্যাকে শান্ত করে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করেছেন তার ভাব ও ভাষার সঙ্গে ঘুমপাড়ানি গানের বিস্ময়কর মিল। কবির পক্ষে কবিতা লেখা তুলনায় সহজ তাই তিনি তার মাধ্যমেই নিজের মনের কথা বলেছেন।

বঙ্গের মহিলা কবি গ্রন্থে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পঙ্কজিনী সম্পর্কে বলেছেন-

> "বিদ্যুতের উজ্জ্বল দীপ্তি যেমন হঠাৎ আপনাকে প্রকাশ করিয়া আবার হঠাৎ নিভিয়া যায়, ফুল যেমন ফুটিতে না ফুটিতে অনেক সময় বৃন্তচ্যুত হইয়া কঠিন ধরণীর বুকে ঝরিয়া পড়ে, স্বর্গীয়া পঙ্কজিনী বসুও তাঁহার কবিত্ব প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইবার পূর্বেই ১৯০০ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর সতেরো বছর পূর্ণ না হইতেই পরলোকগমন করেন।"[২১]

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বক্তব্য থেকে স্পষ্টতঃ বোঝা যায়, খুব অল্প সময়ের জন্য কাব্যচর্চা করলেও বঙ্গীয় মহিলা কবিকুলের মধ্যে তিনি অন্যতমা এবং শুধু তাইই নয়; সহৃদয় পাঠকের মনে তাঁর কবিতার আবেদন যথেষ্ট। পঙ্কজিনী বসুর দুটি কবিতা 'বাসন্তী পঞ্চমী' ও 'জীবন্ত পুতুল' The Heritage of India Series এর *Poems by Indian Women* গ্রন্থে অনূদিত হয়েছিলো। 'Spring Fifth'[২২] ও 'Living Doll'[২৩] শিরোনামে এই কবিতাদুটির অনুবাদ করেছিলেন Miss White House নামে জনৈক ইংরেজ মহিলা। এই বইটিতে রামী (বৈষ্ণব পদাবলী), মাধবী দাসী, আনন্দময়ী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, প্রিয়ংবদা দেবী, সরোজাবালা সেন (দাসগুপ্ত) প্রমুখ বাঙালী মহিলা কবিদের কবিতার অনুবাদ করা রয়েছে। আবার শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গসাহিত্যে নারী প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে কবি পঙ্কজিনী বসুর পরিচয় দিয়েছেন। সেখানেই তিনি *স্মৃতিকণা*-র প্রকাশ সম্পর্কে বলেছেন-

> "১৯০১ সনে 'হেলেনা' কাব্যের লেখক আনন্দচন্দ্র মিত্র স্বীয় ভূমিকা সহ 'স্মৃতি-কণা' নামে পঙ্কজিনীর কবিতাগুলি প্রকাশ করেন। পনর বৎসর পরে ১৯১৬ সনে ইহার পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়, এই সংস্করণে খ্যাতনামা পণ্ডিত হরিনাথ দে কর্তৃক 'সূর্যমুখী' কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ স্থান পাইয়াছে।"[২৪]

পঙ্কজিনী সরল গদ্যেও নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর যেটুকু শিক্ষা তা মূলতঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশিদাসী মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে হয়েছিল। সাধারণতঃ মানুষ নিজের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী পরিচিত বৃত্তের মধ্যে

থাকতে স্বচ্ছন্দবোধ করে আর সেকারণেই হয়তো তিনি শব্দ আর ছন্দকেই নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে একান্ত বিশ্বস্ত সঙ্গীর মতো করে গড়ে তুলেছিলেন। নিজের কন্যাসন্তান ঊষাকে অবলম্বন করে রচিত তাঁর ‘জীবন্ত পুতুল’ কবিতাটি তাঁর সেই ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি প্রকাশের নিদর্শন।

বয়সের নিরিখে কবি পঙ্কজিনী বসু নিতান্তই কিশোরী। আয়ুষ্কাল খুব কম হওয়া সত্ত্বেও জীবন ও জাগতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি যে ভুয়োদর্শী ছিলেন সে কথা তাঁর কবিতার বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব। কবি হিসেবে কবিত্বশক্তির নিরিখে, শব্দচয়নে তিনি হয়তো অনন্য লিখনশৈলীর অধিকারী হয়ে উঠতে পারেননি; জীবন তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি। কিন্তু একথাও সত্যি, জীবনের অভিজ্ঞতা মানুষকে সমৃদ্ধ করে, কিন্তু তাঁর সহজ-সরল শব্দচয়ন, মনের আবেগ ফল্গুধারার মতো কবিতার ছত্রে ছত্রে বয়ে চলেছে। কোনো মানুষ (লেখক-পাঠক উভয়ই) যত বেশি সংখ্যক ও যত বেশি ধরনের বই পড়ে তার লেখকসত্ত্বা ও পাঠকসত্ত্বা যেন সময়ের সাথে সাথে ততখানি পরিণত হতে থাকে। কিন্তু কবি পঙ্কজিনী বসুর বিষয়ে সেকথাও প্রযোজ্য নয় কারণ তাঁর বয়স ও প্রথাগত শিক্ষার সীমাবদ্ধতা। অথচ বারবার পঙ্কজিনীর সাবলীলতা পাঠককে বিস্মিত করে, মুগ্ধ করে। নৈর্ব্যক্তিক ভাবে শুধুমাত্র পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অনায়াস যাত্রা, সমাজচেতনা, আধ্যাত্মিকতার বোধ সবকিছু মিলিয়েই যেন উনিশ শতকের কিশোরী কবি পঙ্কজিনীর কাব্যচর্চা এক অনন্য মাত্রা পায়। মুগ্ধ পাঠকের হৃদয়ে ধ্বনিত হতে থাকে চিরন্তনী সুর-

“এ অসীম বিশ্বমাঝে আপনারে হারাইয়ে
এ মহান বিশ্বখেলা দেখিব মোহিত হয়ে।”[২৫]

Reference:

১. বসু, পঙ্কজিনী, স্মৃতিকণা, পদ্মা-গঙ্গা পাবলিকেশন (নতুন সংস্করণ), কলকাতা, ‘পূর্বলেখ’। এই অংশটি কবি পঙ্কজিনী বসুর দৌহিত্র শ্রী দেবব্রত গুহের লেখা; তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্মৃতিকণা গ্রন্থটি নতুনভাবে পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছিল।
২. বসু, পঙ্কজিনী, স্মৃতিকণা, নতুন সংস্করণ, ‘বিজ্ঞাপন’ অংশ।
৩. তদেব
৪. তদেব
৫. তদেব, পৃ. ১৬
৬. তদেব, পৃ. ২৪
৭. যোগেন্দ্রনাথ, গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, ঢাকা, কলকাতা, পৃ. ২১০
৮. M. R. Kale, The Raghuvamsa of Kālidāsa, Mlbd, Delhi, P. 3
৯. বসু, পঙ্কজিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১০. তদেব
১১. তদেব, পৃ. ২০
১২. তদেব, পৃ. ২১
১৩. তদেব, পৃ. ২৭
১৪. তদেব, পৃ. ২৯
১৫. তদেব, পৃ. ৭২
১৬. তদেব, পৃ. ৭৩
১৭. তদেব
১৮. তদেব, পৃ. ৭৮

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 96 - 103
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৯. তদেব, পৃ. ৯৮

২০. তদেব, পৃ. ৯৯

২১. গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

২২. The Heritage of India: Poems by Indian Women, Margaret Macnicol (Ed.) London, Calcutta, 'Basanta Pañchamī', p. 82

২৩. 'The living Doll' p. 88

২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ, বঙ্গসাহিত্যে নারী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা(বর্তমান কলকাতা), পৃ. ২৭

২৫. বসু, পঙ্কজিনী, প্রাগুক্ত, 'জীবন রহস্য', পৃ. ২১